আর এভাবেই রাসূলগণ পরীক্ষিত হতেন কিন্তু শেষ সাফল্য তাদেরই

শায়খ আবু মুসআব আয-যারকাওয়ি ﷺ

মাকতাবাহ আল-হিম্মাহ

বাংলা ভাষায় প্রকাশ:
যুল কায়দাহ ১৪৩৮ হিজরি

মূল প্রকাশনার শিরোনাম এবং প্রকাশের তারিখ:

وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة - ذو الحجة 1425

অনুবাদে:
মাকতাবাহ আল-হিম্মাহ

আর এভাবেই
রাসূলগণ পরীক্ষিত হতেন

কিন্তু শেষ সাফল্য তাদেরই

শায়খ আবু মুসআব আয-যারকাওয়ি تقبله الله

"আলিফ-লাম-মীম। মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা ঈমান এনেছি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমি তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছি। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই মিথ্যুকদেরকে জেনে নেবেন।" [আল আনকাবুত: ১-৩]

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি ইসলামকে তাঁর নুসরত দিয়ে সম্মানিত করেন, শিরককে তাঁর শক্তি দিয়ে অপদস্থ করেন, তাঁর হুকুমে সবকিছু পরিচালনা করেন আর কুফফারদের তাঁর পরিকল্পনা মাফিক ধ্বংসের দিকে ধাবিত করেন। তিনি ন্যায়বিচারের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, মুমিন আর কাফিরদের মাঝে পালাক্রমে বিজয় আসবে, আর তাঁর অনুগ্রহে মুত্তাকীগণ শেষ কল্যাণের অধিকারী হবে। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তার প্রতি, যার তরবারি ইসলামের রশ্মিকে উচ্চকিত করেছে। অতঃপর,

এই হলো আপনাদের জন্য আমার কিছু কথামালা। আপনাদের জন্য এখানে হৃদস্পন্দন পেশ করছি, যা আমি অন্তরের গভীর থেকে উৎসারিত।

এখানে লড়াইয়ের ঘনঘটা আর যুদ্ধের দামামায় অবস্থানরত এক সৈনিক, আবু মুসআব আয-যারকাওয়ির পক্ষ থেকে, বর্তমান সময়ের যেকেউ এই বার্তা পাবে তাদের এবং মর্যাদাসম্পন্ন তাবৎ মানবকুলের প্রতি... এই ক্ষয়িষ্ণু উম্মাহ'র দুঃখ-দুর্দশা আমাকে নিরন্তর ভারাক্রান্ত করে। অপমানিত এই উম্মাহ'র আত্মার আর্তনাদ আমাকে সবসময় তাড়া করে। এত মহাগৌরব আর অনন্য মর্যাদার উম্মাহ, আজ গাদ্দারদের হাতে সবদিক থেকে লাঞ্ছিত, ফলে অবমাননা আর অপমানের পেয়ালা থেকে পান করেছে, দমন-নিপীড়ন আর বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা আক্রান্ত, একে তার দায়িত্ব-কর্তব্য থেকে সরিয়ে

রাখা হয়েছে – ফলে তার স্বপ্ন আর আশা হয়েছে সুদূর পরাহত।

এই ব্যাধি পুরো শরীরকে গ্রাস করেছে, যা তাকে ভূলুণ্ঠিত করে খুঁটির সাথে বেঁধে ফেলেছে, দুনিয়ার নেকড়ে পশুরা ছুটে গিয়েছে তার প্রতি, তাদের নখর দন্তের আঘাতে তার প্রত্যঙ্গ গুলো কেটে টুকরো টুকরো করেছে। ঠিক তেমনটিই রাসূল ﷺ বলেছেন, আহমাদ ও আবু দাউদ সাওবান থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূল ﷺ বলেন, "জাতিসমূহ সকল প্রান্ত থেকে একে অন্যকে আহবান করবে, খাওয়ার জন্য একজন আরেকজনকে যেভাবে আহবান করে সেরকম" আমরা বললাম 'হে রাসূলুল্লাহ ﷺ, সেদিন আমাদের সংখ্যা স্বল্পতার কারণে কি এমনটি হবে?' তিনি ﷺ বললেন, 'সেদিন তোমরা সংখ্যায় অনেক হবে, কিন্তু তোমরা হবে ফেনা, স্রোতের ফেনার মত, তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে ভীতি দূর করে দেয়া হবে আর তোমাদের অন্তরে ওয়াহান স্থাপন করে দেয়া হবে' আমরা জিজ্ঞেস করলাম 'ওয়াহান কি?' তিনি ﷺ বললেন, 'জীবনের প্রতি মোহ আর মৃত্যুর প্রতি ঘৃণা" আহমাদের অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে, তিনি ﷺ বললেন "আর লড়াইয়ের প্রতি তোমাদের বিরাগ।"

হে আহলুল ইসলাম, জেনে রাখুন, ইবতিলা (পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া) লম্বা ইতিহাসেরই অংশ, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" দুনিয়াতে নাযিল হওয়ার পর থেকেই নবী, সিদ্দিক, মুওয়াহহিদদের ইমামগণ পরীক্ষিত হয়ে এসেছেন। আর যে কেউই "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বহন করতে এগিয়ে যাবে, সমর্থন করবে এবং দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা করবে, তাকে অবশ্যই এই সম্মানের দাম দিতে হবে, যা হল চরম পরিশ্রান্তি, ক্লান্তি আর ইবতিলা।

তার পরিপ্রেক্ষিতে আপনার অবস্থান কোথায়? এই পথ চরম ক্লান্তির, এই পথেই আদম عليه السلام ক্লান্ত হয়েছিলেন, নূহ عليه السلام হয়েছিলেন শোকার্ত, ইবরাহিম عليه السلام কে নিক্ষেপ করা হয়েছিল অগ্নিকুণ্ডে, ইসমাইল عليه السلام কে শোয়ানো হয়েছিল জবাই করার জন্য, ইউসুফ عليه السلام

কে বিক্রি করা হয়েছিল স্বল্পমূল্যে ও কারাবন্দী হয়েছিলেন কয়েক বছরের জন্য, জাকারিয়া عليه السلام কে করাত দিয়ে চিরে করা হয়েছিল দুই টুকরো, ইয়াহিয়া عليه السلام কে করা হয়েছিল শিরশ্ছেদ, আইয়ুব عليه السلام হয়েছিলেন চরম ক্ষতির শিকার, দাউদ عليه السلام কেঁদেছিলেন অঝোরে, ঈসা عليه السلام হেঁটেছিলেন বন্য জন্তুদের সাথে, আর মুহাম্মাদ ﷺ সহ্য করেছেন চরম দারিদ্র্য ও সব ধরনের কষ্ট... আর আপনি বিনোদন আর খেলা-ধুলায় মত্ত থেকে কল্যাণ হাসিল করবেন?!

আল্লাহ তাঁর কিছু সৃষ্টিকে পরীক্ষা করেন অন্যদের দিয়ে, মুমিন যেমন কাফিরের মাধ্যমে পরীক্ষিত হয়, তেমনি ভাবে কাফিরও মুমিনের মাধ্যমে পরীক্ষিত হয়। এই পরীক্ষা তাদের সবার ক্ষেত্রেই ঘটে। আল্লাহ বলেন "বরকতময় তিনি, যার হাতে রাজত্ব। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন-কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।" [আল-মুলক: ১-২]

নবী ﷺ বর্ণনা করেন যে, তার রব বলেন, "আমি তোমাকে পাঠিয়েছি শুধু তোমাকে পরীক্ষা করতে আর অন্যদের তোমার মাধ্যমে পরীক্ষা করতে।" (ইয়াদ ইবনে হিমারের হতে বর্ণিত, মুসলিম) কুরআন-সুন্নাহ থেকে আমরা জানি যে, কিছু আম্বিয়া যেমন: ইয়াহিয়া عليه السلام নিহত ও বিকলাঙ্গ হয়েছিলেন তাদের শত্রুদের হাতে, আবার কারো কারো লোকেরা তাদেরকে হত্যার চেষ্টা করেছিল কিন্তু তারা নিরাপদে ফিরে এসেছিলেন যেমন: ইবরাহিম عليه السلام যিনি শামে হিজরাহ করেন আর ঈসা عليه السلام কে আকাশে তুলে নেয়া হয়।

আমরা দেখি কিছু মুমিন ভয়ানক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন; তাদের কাউকে আগুনের গর্তে নিক্ষেপ করা হয়েছে, কেউ শাহাদাত বরণ করেছেন, আবার অনেকে নিদারুণ কষ্ট, বেদনা ও জুলুমের মাঝে বেঁচে আছেন। তাহলে দুঃখ ভারাক্রান্ত এই জীবনে প্রাণহানি বা তীব্র অত্যাচারের শিকার হবার পর আল্লাহর প্রতিশ্রুত সাহায্য

কোথায়?

ইবতিলা তাঁর সৃষ্টিকূলের জন্য আল্লাহর কদরের অংশ, কিন্তু আল্লাহর আনুকূল্য পেতে বিশেষ ভাবে বাছাই করা বান্দাদের জন্য তা তীব্র হয়। বিশেষ করে মুজাহিদিন, তাদের পরীক্ষা অনিবার্য যার মাধ্যমে তারা পরিশোধন, শৃঙ্খলা আর পরিমার্জনার শিক্ষা পেয়ে থাকেন।

সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছিলেন, "হে রাসূলুল্লাহ ﷺ, কারা সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার শিকার হন?" তিনি ﷺ [উত্তরে] বললেন, "নবীগণ, তারপর সালিহিন মুমিনগণ, তারপর অন্যরা। সবাই তার দ্বীনদারী অনুসারে পরীক্ষিত হয়, কারো দ্বীন যদি দৃঢ় হয় তার পরীক্ষা বেড়ে যায়। কিন্তু তার দ্বীনের অবনতি ঘটলে তার পরীক্ষা সহজ হয়ে যায়। আর মুমিন পৃথিবীর বুকে নিষ্পাপ অবস্থায় না চলা পর্যন্ত তার পরীক্ষা অব্যাহত থাকে"।

শুয়াব আল ইমানে আল বায়হাকি বর্ণনা করেন, আত-তাবারানি আল-মু'জাম আল-কাবিরে, ইবনে সাদ আত-তাবাকাতে আবদিল্লাহ ইবনে ইয়াস ইবনে আবি ফাতিমাহ হতে, তিনি তার বাবা হতে, তিনি তারা দাদা হতে বর্ণনা করেন, যিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে বসেছিলাম, তিনি ﷺ বললেন, 'কে স্বাস্থ্যবান হতে চায় আর অসুস্থ হতে চায় না?' আমরা বললাম, 'আমরা, হে রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি বললেন, 'কি?!' আর আমরা তাঁর মুখমণ্ডলে একটা আভাস দেখলাম। তিনি ﷺ বললেন, 'তোমরা কি দ্রুতগামী গাধা হতে চাও?' তারা বললেন, 'না, হে রাসূলুল্লাহ ﷺ'। তিনি ﷺ বললেন, 'তোমরা কি এমন মানুষ হতে চাও না, যারা পরীক্ষিত হবে এবং ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে?' তারা বললেন, 'অবশ্যই, হে রাসূলুল্লাহ ﷺ'। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তবে আল্লাহর কসম, আল্লাহ মুমিনকে অবশ্যই পরীক্ষা করেন, তিনি তাকে পরীক্ষা করেন, কারণ তিনি তার প্রতি যত্নবান।

সে আল্লাহ’র কাছে বিশেষ কোন পদমর্যাদা রাখে, যা কোন সৎকর্ম দিয়ে সে হাসিল করতে পারবে না, তবে আল্লাহ তাকে পরীক্ষা করবেন এবং সেই পরীক্ষার মাধ্যমে সে সেই মর্যাদায় পৌঁছাবে।’”

জাবির ﵁ হতে আত-তিরমিযি বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “কিয়ামতের দিনে পরীক্ষার সম্মুখীনদের অবারিত পুরষ্কার দেখে অনুগ্রহ প্রাপ্তরা চাইবে তাদের চামড়া যদি কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলা হত।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি অনুগ্রহ প্রাপ্তকে কিয়ামতের দিনে আনা হবে, আল্লাহ বলবেন, ‘তাকে দোযখের আগুনে ডুবাও, তারপর তাকে ফিরিয়ে আনা হবে তাঁর কাছে আর তিনি বলবেন, ‘হে আদম সন্তান, তুমি কি কখনো অনুগ্রহে ছিলে? তুমি কি কখনো আরাম দেখেছো? তুমি কি কখনো সুখে ছিলে?’ সে উত্তরে বলবে, ‘না, আপনার শক্তির কসম!’ তখন তিনি বলবেন, ‘তাকে দোজখের আগুনে ফিরিয়ে নাও।’ আর দুনিয়ায় সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার শিকার ব্যক্তিকে আনা হবে, আল্লাহ বলবেন, ‘তাকে জান্নাতে একবার ডুবাও’ তারপর তাকে ফিরিয়ে আনা হবে তাঁর কাছে আর তিনি বলবেন, ‘হে আদম সন্তান, তুমি কি কখনো এমন কিছু দেখেছো যা তোমার ভাল লাগেনি? সে উত্তরে বলবে, ‘না, আপনার শক্তির কসম, আমি আমার অপছন্দনীয় কিছু কখনো দেখি নি।” (আনাস ইবনে মালিকের রেওয়ায়েতে আহমাদ হতে বর্ণিত)

শাকিক আল-বালখি বলেন, “দুর্ভোগের পুরষ্কার দেখলে কেউ এর থেকে পরিত্রাণ চাইবে না।” আল্লাহ তাঁর দ্বীনের শরীয়তকে পরিপূর্ণ করার জন্য জিহাদের বিধান নাজিল করেছেন, তা ঐশী দাসত্বের চূড়ায় পরিণত হওয়া পর্যন্ত এর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন, আর এর সাথে যুক্ত করেছেন দুঃখ-কষ্ট ও পরীক্ষা যা মানবাত্মা তীব্র অপছন্দ করে আর সেখান থেকে মানুষের মন ভয়ে জড়োসড়ো হয়। তারপর তিনি এটাকে ঈমানের নির্যাস ও তাওহীদের খাঁটি অংশের সাথে সংযুক্ত

করেছেন, যাতে প্রকৃত ঈমানদার ও শক্ত ইয়াকিন সম্পন্ন কিছু লোক ছাড়া কেউ তার তালাশ না করে। আল্লাহ বলেন, “তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে মাল ও জান দ্বারা জিহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ।” [আল-হুজরাত: ১৫]

সুতরাং নফসের বিশুদ্ধিকরণ ও সৃষ্টিকর্তার আদেশ পালনের মাধ্যমে প্রস্তুতি গ্রহণ করায় এবং তাঁর ওয়াদার দিকে ধাবিত হওয়ায় জিহাদের বাস্তবতা নিহিত আছে। তা সম্ভব হত না, যদি দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদ দ্বারা এই পথ বিজড়িত না থাকত। আর তাই আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন, “আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, আল্লাহ কখনই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না। তিনি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন এবং তাদের অবস্থা সংশোধন করবেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন।” [মুহাম্মাদ: ৪-৬], তিনি আরও বলেন, “আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তারা পরস্পর লড়াই করত, কিন্তু আল্লাহ তাই করেন, যা তিনি ইচ্ছা করেন।” [আল-বাকারাহ: ২৫৩]

এই আয়াতের তাফসিরে ইবনে কাসির বলেন, “এর মানে হল তিনি কিছু জিনিস দিয়ে পরীক্ষা করবেন যার দরুন তাঁর শত্রু-মিত্র প্রকাশিত হবে। এভাবে ধৈর্যশীল মুমিন ও প্রতারক মুনাফিক উভয়কেই চেনা যাবে। এটা উহুদের যুদ্ধের প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে, যেখানে আল্লাহ মুমিনদের পরীক্ষা করেছেন। তাই তাদের ঈমান, ধৈর্য, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আনুগত্য এবং দৃঢ়তা প্রকাশিত হয়েছে, একই ভাবে মুনাফিকদের প্রতারণা উন্মোচিত হয়েছে, তাদের জিহাদের বিরোধিতা ও প্রত্যাখ্যান করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি তাদের বিশ্বাসঘাতকতা পরিষ্কার হয়েছে।

হে আল্লাহর বান্দা, ভেবে দেখুন, আল্লাহর এই বাণী, “মানুষের

মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে আল্লাহর ইবাদত করে। যদি সে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, তবে ইবাদতের উপর কায়েম থাকে এবং যদি কোন পরীক্ষায় পড়ে, তবে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।” [আল-হাজ্জ: ১১]

আল-বাগ্বাওয়ী তার তাফসিরে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, “মরুবাসী বেদুইন আরব রাসূলুল্লাহ’র ﷺ প্রতি ঈমান আনে। ইসলামে দাখিলের পর সে পুত্র সন্তান লাভ করে, তার গবাদি পশু বাচ্চা দান করে এবং তার সম্পদ বৃদ্ধি পায়, তখন সে বলে ‘এটা ভাল দ্বীন;’ সে ঈমান আনে এবং এর উপর অটল থাকে। কিন্তু যদি সে পুত্র সন্তান লাভ না করে, গবাদি পশু বাচ্চা না দেয়, তার সম্পদ না বাড়ে এবং সে খরা বা সন্তানহীনতা দ্বারা পরীক্ষিত হয়, সে বলে, ‘এটা খারাপ দ্বীন;’ সে তার কুফর ও একগুঁয়েমির কারণে দ্বীন ত্যাগ করে।”

আয-যিলাল এর লেখক বলেন, “সত্যের সংগ্রামে অটল থাকার পরীক্ষায় নফসকে প্রস্তুত করতে হবে, যে সংগ্রাম বিপদ, কষ্ট, ক্ষুধা আর জীবন, সম্পদ ও ফসলহানী দিয়ে পরিপূর্ণ। আকিদার চাহিদা পূরণ করতে মুমিনের জন্য এই পরীক্ষা অনিবার্য, যাতে সেই আকিদার দাবি অনুযায়ী দাসত্ব পরিপূর্ণ করতে পারে। দাসত্বের সমানুপাতে তাদের হৃদয়ে ঈমান প্রোথিত হবে এবং এর ফলে বিপদের প্রথম আঘাতে সে মুষড়ে পড়বে না। হৃদয়ে আকিদার ভালবাসা ও নৈকট্যের জন্য এই দাসত্বের মূল্য দিতে হয়। আর এর কারণে যখন তারা কষ্টের স্বীকার হয়, এর প্রতি তাদের ভালবাসা আরও বেড়ে যায় আর একে ধারণের যোগ্যতা বাড়তে থাকে। একইভাবে, ইবতিলা ও ইবতিলার সময়কার ধৈর্য ধারণ ছাড়া অন্যরা এর মূল্য বুঝবে না আর বালা-মুসিবত অনবরত চলতে থাকে। সাহাবাদের আকিদার দৃঢ়তা এর মাধ্যমেই অর্জিত হয় কারণ দুঃখ-কষ্টে রয়েছে এক গোপন শক্তি। মুমিনের অন্তরে অনেক গোপন ক্ষেত্র থাকে যা কেবল সেই দুঃখ-কষ্ট ভোগের ফলে প্রকাশিত হয়।”

আশ-শাফী কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "মুমিনের জন্য কোনটা বেশি ভাল, পরীক্ষিত হওয়া নাকি তামকীন লাভ করা?" তিনি জবাব দিলেন, "তোমার উপর রহমত বর্ষিত হোক, পরীক্ষা ছাড়া তামকীন লাভ হয় নাকি?"

সাফওয়ান ইবনে উমার বলেন, "আমি হিমসের ওয়ালী ছিলাম, সেখানে দামেস্কের এক বৃদ্ধের সাথে দেখা হয় যার ভ্রূগুলো চোখের উপর এসে গিয়েছিল। তিনি তার উটের উপর ছিলেন, যুদ্ধের দিকে যাচ্ছিলেন। আমি উনাকে বললাম, 'চাচা, আল্লাহ তো আপনাকে ওজর দিয়েছেন।' তিনি তার ভ্রূ তুলে বললেন, 'ভাতিজা, আল্লাহ আমাদের যুদ্ধের জন্য সমবেত করেছেন, আমরা ভারী হই বা হালকা।'" নিশ্চয়ই আল্লাহ যাদের ভালবাসেন তাদের পরীক্ষা করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ যাদের ভালবাসেন তাদের পরীক্ষা করেন।

নিশ্চয়ই কঠিন দিনে ধৈর্য ধারণের প্রতিদান আছে,
আর ধৈর্য শুধু সম্মানিতদের জন্য।
তাই আল্লাহ সত্বর বিজয় মঞ্জুর করবেন।
পরে আপনার ক্লান্তিকর মুহূর্ত শান্তি দিয়ে পরিবর্তন করবেন।

আয-যিলালের লেখক আরও বলেন, "আসলে, ঈমান কেবল উচ্চারিত শব্দ নয়, বরং এটা এক বাস্তবতা যা দাসত্বের আমলে পরিপূর্ণ, এক আমানত যা দায়িত্বে পরিপূর্ণ, এক জিহাদ যার জন্য দরকার অনেক ধৈর্য আর এক প্রয়াস যার জন্য দরকার কষ্ট সহিষ্ণুতা। তাই, 'ঈমান এনেছি' এই ঘোষণা যথেষ্ট নয়। বরং এই দাবির পর সে ফিতনার সম্মুখীন হবে, যদি সে দৃঢ়তার পরিচয় দেয়, তাহলে সে খাঁটি ও অকৃত্রিম হৃদয়ের অধিকারী হবে, যেমন ভাবে আগুনে পুড়ে সোনা খাঁটি হয়। এটাই এই শব্দের [অর্থাৎ ফাতানা ইয়াফতিনু] সাথে সংশ্লিষ্ট যত অর্থ আছে তা সহকারে এর শাব্দিক অর্থ, ফিতনাহ হৃদয়ের সাথে এমনটাই করে থাকে। ঈমানের জন্য এই ফিতনা এক প্রতিষ্ঠিত মূলনীতি যা আল্লাহ'র আদেশক্রমে

সংঘটিত হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আমি তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই মিথ্যুকদেরকে জেনে নিবেন।" [আল-আনকাবুত: ৩] আর ঈমান দুনিয়াতে আল্লাহর এক দায়ভার, তার সক্ষম ও যোগ্য ব্যক্তি ছাড়া কেউ তা বহন করতে পারে না, যাদের হৃদয় শুধু ঈমানের জন্য নিবেদিত এবং যারা আরাম আয়েশ, নিষ্ক্রিয়তা, নিরাপত্তা, বিনোদন ও যা কিছুই নফস পছন্দ করে তার উপর একে প্রাধান্য দেয়। এটা দুনিয়াতে খিলাফাহ'র দায়িত্ব যা মানুষকে আল্লাহর পথে চালিত করে এবং তাঁর বাণী জীবনে বাস্তবায়ন করে। তাই এ এক মহান দায়িত্ব, এক গুরু দায়ভার। আর এটা আল্লাহর আদেশের অংশ যার ভার মানুষকে কাঁধে নিতেই হবে, আর তা বিশেষ লোকদের পক্ষে সম্ভব যারা পরীক্ষায় ধৈর্য ধারণ করতে পারে।"

তাই যারা লড়াই করে, আল্লাহ রাস্তায় জিহাদের পথ পাড়ি দেয়, তাদের লড়াইয়ের এই রূপটি এবং এর লক্ষ্যে পৌঁছাতে যা যা দরকার, তা ভাল ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে - এই পথ সালেহীনদের রক্তসিক্ত হতে হবে, এই পথে অনেককে তাদের প্রিয়জন, সাথী-বন্ধু ও বাসভূমি হারাতে হবে। এমনটিই করেছেন নবীর সাহাবাগণ, যারা নবীগণের পরে ছিলেন সৃষ্টির সেরা। হিজরার কষ্ট সয়েছেন, আর সয়েছেন সম্পদ, পরিবার ও বাড়িঘর হারানোর বেদনা, সবই আল্লাহর রাহে... এই প্রেক্ষিতে আমাদের অবস্থান কোথায়?

এই দলের যা করতে হবে তা হল, এই বাছাইকৃত পথে অটল থাকা, আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা বালা মুসিবতে পুরষ্কার তালাশ করা, তা যেমনই হোক – নেতার মৃত্যু বা কর্মীদের প্রাণহানি, আর এই পথে অটল থাকা; জেনে রাখা এটা আল্লাহর রীতি আর আল্লাহ এই উম্মাহ থেকে সালেহীন বান্দাদের বাছাই করে নেন। তারা নুসরতের জন্য তাড়াহুড়া করবে না, কারণ তার আগমন অনিবার্য।

মুসলিমের জন্য এটা জানা জরুরি যে সত্যের অনুসরণ আর তার

উপর ধৈর্য ধারণ নুসরত ও বিজয় লাভের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথ, যদিও চলার পথ দীর্ঘ, বাধায় পরিপূর্ণ ও পথিকের সংখ্যা স্বল্প হয়। আর সত্য থেকে বিচ্যুতি কেবল হতাশাই বয়ে আনে, যদিও তার পথ সহজ এবং এর পথিকেরা ভাবে বিজয় নিকটে - তা আসলে বিভ্রম।

আল্লাহ বলেন, “নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা হলে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযত হও।” [আল-আন'আম: ১৫৩]

এটাই জিহাদ... এক চূড়া... এক ফল... যা আসে দীর্ঘ ধৈর্য ও যুদ্ধের ময়দানে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করার পর, তথা শত্রুর জন্য ওঁত পেতে থাকা এবং তাদের ক্ষতির শিকার হবার পর। এই অবস্থান মাস গড়িয়ে বহু বছর ধরে হবে। আর আপনি যদি এই ব্যথার স্বাদ না নেন, আল্লাহ আপনাকে কখনোই তাঁর নুসরতের মাধ্যমে বিজয় দেবেন না, কারণ কেবল ধৈর্যের সাথেই তাঁর নুসরত আসে।

ইবনে তাইমিয়্যাহ ﵀ বলেন, “দ্বীনের নেতৃত্ব আসে কেবল সবর ও ইয়াকিন মাধ্যমে।” সত্যের ধারণা আর আকিদাহ ও তাওহীদের সত্যনিষ্ঠা প্রাণহীন শরীর হিসেবে অলীক পৃথিবীতে পড়ে থাকে, কোন আত্মা সেখানে প্রবেশ করে না, যদি না সেটাকে সত্যনিষ্ঠ ও ধৈর্যশীল মানুষেরা তুলে নেয়, যারা এই পথে ক্লেশের ভারী বোঝা বহন করবে। যন্ত্রণা তাদের কাছে মনোরম আর অবসাদ সুমিষ্ট। তারা মরণ ছাড়া কিছুই গ্রহণ করবে না, যাতে এই ধারণাগুলোকে সরেজমিনে বাস্তবায়ন করে জীবিত করা যায়, তাদের মত নয় যারা এগুলোকে কেবল তাত্ত্বিকতা ও দার্শনিকতার ফ্রেমে আর সুন্দর বাচনভঙ্গিতে দান করা ভাষণের অলঙ্করণে বেঁধে রাখে, যা সক্রিয়তা, সত্যনিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন থেকে অনেক দূরে।

ইসলামের আজ দরকার তাদের যারা সত্যবাদী, ধৈর্যশীল, কঠোর

পরিশ্রম করতে আগ্রহী, যারা খাটুনিতে আনন্দ খুঁজে পায়, ব্যথায় খুঁজে পায় স্বস্তি, যারা নীরবে এই পর্যায়ের চাহিদাকে কার্যে পরিণত করে, সত্য আত্মার মানুষ যাদের রয়েছে সুউঁচু লক্ষ্য আর দৃঢ় সংকল্প যারা জানে কিভাবে লক্ষ্যের বাস্তবায়ন করতে হয়। তাই তারা ক্লান্তিতে জড়াতে ও একঘেয়েমির ফাঁদে পড়তে বা তর্ক-বিতর্কে তাদের প্রত্যাশা খরচ করতে অস্বীকার করে।

তাই আপনার জামার হাত গোটান, উৎসুক হাত বাড়িয়ে দিন, আর এই পথের ক্লেশে সবর করুন, বলা হয়, "ব্যর্থ তারাই যারা সব পরীক্ষার জন্য সবরের প্রস্তুতি নেয় না, সব নিয়ামতের শোকর করে না আর জানেনা ক্লেশের সাথেই রয়েছে স্বস্তি"

আত্মার উপর আল্লাহর রহম হোক, আর (কেবল) উচ্চাশা আমাদের
জান্নাতে নিবে না এবং সর্বশেষ ব্যক্তি হবে তওবাহকারী।
স্ফীত বক্ষ কুমারী, আয়ত নয়না নেত্র,
তুবা বৃক্ষের ছায়ায় সুঘ্রাণ যা প্রাপ্য।
স্বর্ণের লণ্ঠন যা সম্মানের সাথে ঝুলন্ত,
রবের আরশ হতে, তাদের জন্য যারা নিহত হয় এবং তারা মৃত নয়, বরং জীবিত।

আল্লাহ বলেন, "আর তারা অল্প-বিস্তর যা কিছু ব্যয় করে, যত প্রান্তর তারা অতিক্রম করে, তা সবই তাদের নামে লেখা হয়, যেন আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সমূহের উত্তম বিনিময় প্রদান করেন।" [আত-তাওবাহ: ১২১]

এই আয়াতের তাফসিরে আত-তাবারী কাতাদার উক্তি উল্লেখ করেন, "যারা আল্লাহর রাহে পরিবার থেকে দূরে যায় তারা অবশ্যই আল্লাহর নিকটবর্তী হয়"।

সুতরাং, ব্যাপারটা আল্লাহর এখতিয়ারে, এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, আর আমরা তাঁর বান্দা ছাড়া কিছুই নই, তাঁর দাসত্ব করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করছি। আর দাসত্বের পূর্ণাঙ্গতা হল আমাদের ইয়াকিন সাথে ও সন্দেহাতীত ভাবে জেনে রাখা যে, আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই পূরণ হবে, আর নুসরত বা বিজয় আসবে, পরীক্ষার জন্য দেরী হতে পারে। মহান আল্লাহ প্রকৃতই বলেন, "মুমিনদের সাহায্য করা আমাদের দায়িত্ব।" [আর-রুম: ৪৭]

আর তিনি তাঁর মুওয়াহিদ বান্দাদের নুসরত আর ধৈর্যশীলদের তামকীনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আর তিনি পূর্ববর্তী জাতিদের কেবল সবর ও তাওয়াককুলের কারণে বিজয়, অবিচলতা ও তামকীন লাভের ইতিহাস ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, "আর যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকেও আমি উত্তরাধিকার দান করেছি এ ভূখণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের, যাতে আমি বরকতময় করেছি এবং পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তোমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত কল্যাণ বনী-ইসরাইলদের জন্য তাদের ধৈর্যধারণের দরুন। আর ধ্বংস করে দিয়েছে সে সবকিছু যা তৈরি করেছিল ফিরাউন ও তার সম্প্রদায় এবং ধ্বংস করেছি যা কিছু তারা নির্মাণ করেছিল।" [আল-আ'রাফ: ১৩৭]

আর ইউসুফ عليه السلام এর সাথে যা ঘটেছিল তা থেকে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে শক্তি ও দৃঢ়তার দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন, লম্বা বিচ্ছেদ আর আজিজের প্রাসাদের ঘটনার পর। তা এসেছিল কেবল তার সবর ও তাকওয়ার মাধ্যমে, "নিশ্চয় যে তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সবর করে, আল্লাহ এহেন সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।" [ইউসুফ: ৯০]

তিনি সফলতাকে সবরের সাথে সংযুক্ত করেছেন, তিনি বলেন, "হে ঈমানদারগণ! সবর কর এবং মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" [আলে ইমরান: ২০০] আর তিনি উল্লেখ করেছেন যে

ধৈর্যশীল ও মুত্তাকীদের জন্য এই দুনিয়ায় রয়েছে সুন্দর সমাপ্তি। “আপনি ধৈর্যধারণ করুন। যারা ভয় করে চলে, তাদের পরিণাম ভাল, সন্দেহ নেই।” [হুদ: ৪৯]

আমাদের ইয়াকিন আছে যে, আল্লাহর কৃত ওয়াদার কখনোই ব্যতিক্রম হবে না, আমরা এই বিষয়টি উল্লেখ করছি, কারণ এই ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সীমিত, এর ফলে আমরা কেবল এক প্রকারের নুসরত দেখি যা বিজয়ের দিকে নিয়ে যায়; যদিও এটাই যে সেই নুসরত হতে হবে, যা তিনি নবী, রাসূল ও মুমিন বান্দাদের ওয়াদা করেছেন, এমনটি আবশ্যক নয়। বস্তুত, নুসরত বিভিন্ন রূপে আসতে পারে যা দুর্বল ও বিচলিত অন্তর দেখতে সক্ষম নয়।

কুরাইশ গোত্ররা ঐক্যবদ্ধ ভাবে মুমিনদেরকে একঘরে করে আবু তালিব পাহাড়ের গিরিপথে বনু হাশিমের সাথে আটকে রেখে ছিল। তিন বছর ধরে চলা এই অবরোধে তারা তাদের সাথে কেনা-বেচা বন্ধ রেখেছিল, এর ফলে জমিতে জন্মানো সামান্য কিছু ছাড়া তাদের কোন খাবার ছিল না। আল্লাহর রহমত না আসলে মুমিনরা প্রায় বিলুপ্ত হতে যাচ্ছিলেন।

দ্বীনে আপোষ করতে না চাওয়ায় আসহাব আল-উখদুদকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তারা আল্লাহর রাহে মৃত্যুকেই বেছে নিয়েছিলেন। তাগূত বিশাল গর্ত খনন করে এবং তাতে অগ্নিসংযোগ করে, তার রক্ষী ও সেনাদেরকে মুমিনদের আগুনে নিক্ষেপ করতে আদেশ দেয়। কিন্তু এতে এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল: তাদের কেউই দুর্বল হন নি বা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন নি, তাদের ভয় পেয়ে পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোন রেওয়ায়েত পাওয়া যায় না। বরং একজনের পর আরেকজন সাহস ও বীরত্বের সাথে আগুনের দিকে যেতে লাগলেন, যেন সেই বালক তাদের মাঝে সাহস ও বীরত্ব ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তারা তাঁর সাথে যোগ দিতে তুষ্ট ছিলেন, তারা তাদের দ্বীনের মুক্তিপণ হিসেবে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন করেছিলেন।

সুতরাং তারা অবশ্যই সফল, আল্লাহ এটাকে "এক বিশাল সফলতা" হিসেবে উল্লেখ করেন, "যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্যে আছে জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নির্ঝরিণীসমূহ। এটাই মহা সাফল্য।" [আল-বুরুজ: ১১]

আনাস বিন মালিক ﷺ বলেন, "আমার চাচা, আনাস বিন আন-নযর, বদরের যুদ্ধে অংশ নিতে পারেন নি, তিনি বললেন, 'হে রাসূলুল্লাহ ﷺ, মুশরিকদের বিরুদ্ধে আপনার লড়া প্রথম যুদ্ধে আমি ছিলাম না, কিন্তু যদি আমি মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়ার সুযোগ পাই, আল্লাহ অবশ্যই দেখবেন আমি কি করতে পারি।' উহুদের দিনে যখন মুসলিমরা হোঁচট খেলেন তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ, এরা (মুসলিমরা) যা করেছে তা থেকে আমি আপনার কাছে নিজের জন্য মাফ চাই আর ওরা (মুশরিকরা) যা করেছে তার থেকে আমি মুক্ত।' তারপর তার সাথে সা'দ ইবনে মুয়াযের দেখা হলে তিনি বললেন, 'হে সা'দ ইবনে মুয়ায, জান্নাহ! আন-নযরের রবের কসম, আমি উহুদের কাছে জান্নাতের সুগন্ধ পাচ্ছি!' সা'দ পরে বললেন, 'হে রাসূলুল্লাহ ﷺ, সে যা করেছে আমি তা করতে পারিনি।'" আনাস বললেন, "আমরা তার শরীরে তলোয়ার, বর্শা আর তীরের আশিটির মত আঘাত দেখেছি। তিনি নিহত হলে মুশরিকরা তার মৃতদেহ বিকৃত করে। ফলে তার বোন ছাড়া কেউ চিনতে পারেননি, যিনি তার হাতের আঙ্গুলের ডগা দেখে তাঁকে সনাক্ত করেন। আমরা ভেবেছি এই আয়াতটি তাঁর ও তাঁর মত অন্য যারা আছে তাদের ব্যাপারেই নাযিল হয়: "মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করে নি।" [আল-আহযাব: ২৩]"

খাব্বাবের বর্ণিত হাদিসে আমরা বিজয়ের এই অর্থ পাই, যখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে বললেন, "আপনি কি আমাদের বিজয় অন্বেষণ করবেন না? আপনি কি আমাদের জন্য দোয়া করবেন না?" তিনি বললেন, "তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে কাউকে গর্তে

পোঁতা হত, তার পর করাত এনে তাঁর মাথা বরাবর কেটে তাঁকে দুই টুকরো করা হত; কিন্তু তা তাঁকে তাঁর দ্বীন থেকে সরাতে পারতোনা। ধাতব চিরুনি দিয়ে তাঁর চামড়া খসে নেয়া হত, হাড় ও স্নায়ু থেকে তাঁর মাংস উপড়ে ফেলা হত, কিন্তু তা তাঁকে তাঁর দ্বীন থেকে বের করতে পারতো না।" [বুখারী]

গুপ্ত বিজয়সমূহের মাঝে একটি হল, সত্যের শত্রুরা, যতই দাম্ভিক আর সীমালঙ্ঘনকারী হোক না কেন, তারা তাদের প্রতিপক্ষের ক্ষতি করার আগে সব ধরনের মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে। বেশির ভাগ সময়ে সে তার কুকর্ম শেষ করার পর কোন স্বস্তি বা তুষ্টি পায় না। একারণে আল-হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ যখন সাঈদ ইবনে যুবায়েরকে হত্যা করল, সে সব ধরনের মানসিক অশান্তিতে ভুগেছিল, সে কখনো স্বস্তিতে ঘুমাতে পারতো না, হঠাৎ ভয় পেয়ে জেগে উঠে বলত, "আমি সাঈদের সাথে এ কি করেছি?!" মরণ পর্যন্ত সে এই যন্ত্রণায় ভুগে ছিল।

ক্রুসবাহী আমেরিকান তাগূতদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধে এব্যাপারে আমরা নিশ্চিত। শক্তি আর অস্ত্র-শস্ত্রের জুলুম সত্ত্বেও তাদের নৈতিক ও মানসিক অধঃপতন সুনিশ্চিত।

কুর'আন এই বাস্তবতা ব্যাখ্যা করেছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তারা যখন তোমাদের সাথে এসে মিশে, বলে, আমরা ঈমান এনেছি। পক্ষান্তরে তারা যখন পৃথক হয়ে যায়, তখন তোমাদের উপর রোষবশতঃ আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। বলুন, ক্রোধে জ্বলে-পুড়ে মর। আর আল্লাহ মনের কথা ভালই জানেন। তোমাদের যদি কোন মঙ্গল হয়; তাহলে তাদের খারাপ লাগে। আর তোমাদের যদি অমঙ্গল হয় তাহলে আনন্দিত হয় আর তাতে যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তাদের প্রতারণায় তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে সে সমস্তই আল্লাহর আয়ত্তে রয়েছে।" [আলে ইমরান: ১১৯-১২০] তিনি আরো

বলেন, "আল্লাহ কাফিরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। তারা কোন কল্যাণ পায়নি। যুদ্ধে আল্লাহ মুমিনদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে গেছেন। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।" [আল-আহযাব: ২৫]

অন্তর্দৃষ্টি বিহীন মানুষের কাছে স্পষ্ট নয় যে, আল্লাহ তাঁর মিত্র ও খাঁটি বান্দাদের পরিপূর্ণ সত্যি জীবনের ওয়াদা করেছেন। তিনি বলেন, "আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকা প্রাপ্ত।" [আলে ইমরান: ১৬৯]

যেকেউ তরবারি ছাড়া অন্য উপায়ে নিহত হল।
উপায় হল অনেক, কিন্তু মৃত্যুর মত মৃত্যু একটাই।

বিজয়ের সম্পূর্ণ ধারণা আমাদের কাছে পরিষ্কার হল, আসলে আমরা নির্ধারণ করতে পারি না কি ধরণের বিজয় আমরা চাই।

ফাল্লুজাতে মুজাহিদগণের প্রদর্শিত দৃঢ়তা ও প্রতিরোধের কারণের মধ্যে আছে, রাসূল ﷺ যেমন বলেছেন, পৃথিবীর সকল শক্তি সমগ্র মুমিনদের পরাজিত করতে পারবে না, যার ভয় নূহ عليه السلام বা রাসূল ﷺ এর প্রাথমিক যুগে করা হচ্ছিল। আর রাসূল ﷺ বর্ণনা অনুযায়ী জিহাদ পৃথিবীর বুকে সবসময় জারি থাকবে, যা এই হাদিসে এসেছে, "আমার উম্মত হতে একটি দল সবসময়ই আল্লাহর আদেশের উপর কায়েম থাকবে। যারা তাদের পরিত্যাগ কিংবা বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না যতক্ষণ না আল্লাহর হুকুম চলে আসে এবং তারা সেসময় মানুষের উপর বিজয়ী বেশে বিদ্যমান থাকবে।" (মুয়াবিয়ার রেওয়ায়েতে বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)

বিজয় ও এই দ্বীনের নিয়তি আল্লাহর হাতে। তিনি এর সত্যায়ন করেছেন এবং এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যদি তিনি চান, তিনি

নুসরত দিবেন এবং একে ক্ষমতাশীল করবেন আর যদি তিনি চান তবে বিলম্ব করবেন। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ আর তিনি তাঁর বিষয়াদির ব্যাপারে ওয়াকিবহাল। তাই তিনি যদি বিজয় বিলম্বিত করেন, তা হবে ঈমান ও আহলুল ঈমানের কল্যাণের জন্য এবং তাঁর কোন অদৃষ্ট হিকমাহ'র কারণে আর হক ও আহলুল হককে সাহায্যের ব্যাপারে তাঁর চেয়ে বেশি আন্তরিক আর কেউ নন। আল্লাহ বলেন, "আল্লাহর নুসরতে সেদিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে। তিনি যাকে ইচ্ছা বিজয় দান করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু। এটা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি খেলাফ করবেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।" [আর-রুম: ৪-৬]

গৌরবকে এক টুকরো খেজুর মনে কর না, যা তুমি খেতে পারবে
কখনোই গৌরবের স্বাদ পাবে না, যতক্ষণ না সবরের আস্বাদন করবে

সত্যিই আল্লাহ, তাঁর সামর্থ্য চমকপ্রদ, তাঁর মহিমা পরাক্রমশালী, তিনি মুমিনদের কখনো বিজয় দান করে, আবার কখনো পরীক্ষা করেন, তাঁর নিয়ামত সীমিত করেন, যাতে তারা দুঃখ-কষ্ট উপলব্ধি করে। এর হিকমাহ তিনি জানেন এবং তাঁর দ্বারা নিরূপিত।

পরীক্ষা যতই বড় হোক আল্লাহ তা বরকতময় করেন।
আর আল্লাহ কিছু ব্যক্তিকে নিয়ামত দিয়ে পরীক্ষা করেন।

ইবনুল কাইয়্যিম যাদ আল-মায়াদের এর কিছু হিকমাহ উল্লেখ করেন: এর একটি হল রাসূলদের বৈশিষ্ট্য, যা হিরাকল আবু সুফিয়ানকে বলেছিল, "আপনি তার সাথে যুদ্ধ করেছেন?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ," সে বলল, "তার সাথে আপনাদের যুদ্ধগুলোর (ফলাফল) কেমন?" তিনি বললেন, "পালাক্রমে, কখনো তিনি আমাদের পরাজিত করেন আর কখনো আমরা তাকে করি।" সে বলল, "আর এভাবেই রাসূলগণ পরীক্ষিত হয়েছিলেন, কিন্তু শেষ সাফল্য তাদেরই।" [বুখারী

ও মুসলিম হতে বর্ণিত]

সেই হিকমাহ'র আরেকটি হল, এটা সত্যবাদী মুমিনদেরকে প্রতারক মুনাফিকদের থেকে পৃথক করে দেয়, কারণ আল্লাহ মুসলিমদের বদরে বিজয় দেয়ার পর এবং তাদের সুনাম বাড়ানোর পর অনেকেই কেবল বাহ্যিক ভাবে ইসলামে প্রবেশ করেছিল। আল্লাহর হিকমাহ তাঁর বান্দাদের জন্য এক পরীক্ষা নিয়ে এল, যার মাধ্যমে মুসলিম ও মুনাফিকরা পৃথক হয়ে যায়। মুনাফিকরা সে যুদ্ধে তাদের আসল চেহারা প্রকাশ করে দেয়, মুখ ফসকে বেরিয়ে যায় যা তাদের অন্তরে লুকায়িত ছিল, তাদের ভ্রান্ত পথ প্রকাশিত হয়ে যায়। যা ছিল ইশারা ইঙ্গিত, তা হয়ে পড়ে পরিষ্কার কথা – আর মানুষেরা পরিষ্কার তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়: মুমিন, কাফির ও মুনাফিক। আর মুমিনগণ বুঝতে পারেন তাদের মাঝে শত্রুর উপস্থিতি, এমন শত্রু যা তাদের ছেড়ে দেবে না; তাই তারা তাদের থেকে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নেন।

সেই হিকমাহ'র আরেকটি হল, যদি আল্লাহ সব সময় মুমিনদের সাহায্য ও তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সব যুদ্ধে বিজয়ী করতেন, তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সবক্ষেত্রে সংহত করতেন, তাহলে তাদের নফস সীমা লঙ্ঘন করত, উদ্ধত ও অহংকারী হয়ে যেত। তারা সাহায্য ও বিজয়কে অন্য সাধারণ রিযকের মতই দেখা শুরু করত। কিন্তু তাঁর বান্দারা সুসময় ও দুঃসময়, কাঠিন্য ও স্বস্তি, দারিদ্র ও প্রাচুর্য – সব ধরনের পরিস্থিতির মোকাবেলা না করলে পরিশুদ্ধতা লাভ করতে পারে না আর আল্লাহ তাঁর হিকমাহ সহকারে তাঁর বান্দাদের বিষয়াদি পরিচালনা করেন এবং তিনি তাদের ব্যাপারে জানেন ও তাদেরকে সদা সর্বদা পর্যবেক্ষণ করেন।

সেই হিকমাহ'র আরেকটি হল, তাঁর আউলিয়া ও দলের আল্লাহর দাসত্ব প্রকাশিত হয় সুসময় ও দুঃসময়ে, তাদের পছন্দের সময়ে ও অপছন্দের সময়ে, তাদের বিজয়ের অবস্থায় ও শত্রুদের বিজয়ের অবস্থায়। তাই যদি তারা তাদের পছন্দ-অপছন্দ উভয় অবস্থায় তারা

ইবাদত ও আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকে তারাই তাঁর প্রকৃত বান্দা; তাদের মত নয় যারা তাঁর ইবাদত করে কেবল ভাল, বরকতময় ও সুস্বাস্থ্যের সময়।

সেই হিকমাহ'র আরেকটি হল, যখন পরাজয় ও দখল হওয়ার মাধ্যমে তিনি তাদের পরীক্ষা করেন, যখন তারা অবমানিত, বিভক্ত আর পরাভূত হয়, তারা তাঁর শক্তি ও সাহায্যের তালাশ করে। আর সাহায্য তুলে নিলে অবমাননা আর বিভক্তি নেমে আসে। আল্লাহ বলেন, "বস্তুতঃ আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল।" [আলে ইমরান: ১২৩], আর তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হুনায়নের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি।" [আত-তাওবাহ: ২৫] কারণ তিনি যখন তাঁর বান্দাকে সমর্থন, সাহায্য আর সংশোধন করতে চান, তখন তিনি তাকে পরীক্ষায় ফেলেন। আর তাঁর সমর্থন, সাহায্য আর সংশোধন সে পরিমাণেই আসে যতটুকু অবমাননা আর বিভক্তির সম্মুখীন সে হয়।

সেই হিকমাহ'র আরেকটি হল, আল্লাহ তার মুমিন বান্দাদের জন্য তাঁর মহত্ত্বের আবাস প্রস্তুত রেখেছেন, যেখানে তারা তাদের সৎকর্ম দিয়ে পৌঁছাতে পারবে না; কিন্তু তাদের পরীক্ষা ও দুঃখ-কষ্টের মাধ্যমে সেখানে পৌঁছবে। তাই তিনি তাদের সেখানে পৌঁছার মাধ্যম প্রেরণ করবেন, যা হল পরীক্ষা আর দুঃখ-দুর্দশা। একইভাবে এসবের মাধ্যমে তিনি তাদের সৎকর্ম করার সুযোগ দেন যাতে তারা সফলতা অর্জন করতে পারে।

সেই হিকমাহ'র আরেকটি হল, যদি কেউ সর্বদা অনুগ্রহের মধ্যে থাকে এবং বিজয় আর সম্পদ অর্জন করে তাহলে তা হয়তোবা তাকে সীমালঙ্ঘন ও ইহকালের প্রতি ভালোবাসায় পতিত করবে। যা একটি রোগ, এই রোগ তাকে আল্লাহ ও আখিরাতের দিকে

একনিষ্ঠ ভাবে এগিয়ে যেতে বাধা দেয়। তাদের রব, তাদের মালিক, তাদের দয়াশীল যদি চান তারা তাঁর সম্মান লাভ করবে, তিনি তাদের কদর নির্ধারণ করেন যে তারা পরীক্ষিত হবে এবং ক্লেশের সম্মুখীন হবে, যা সেই ক্ষতিকর রোগের চিকিৎসা। এই ঘাত-প্রতিঘাত সেই ডাক্তারের মত যিনি তার রোগীদের কিছু অরুচিকর ঔষধ দেন যাতে তারা রোগ দূর হয় – আর যদি তার চিকিৎসা না করে ফেলে রাখা হয়, তবে এই রোগ তার ধ্বংস বয়ে আনবে।

সেই হিকমাহ'র আরেকটি হল, শাহাদাত, আল্লাহ একে তাঁর আউলিয়াদের জন্য সর্বোচ্চ মর্যাদা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। শহীদগণ তাঁর একান্ত বিশেষজন, তাঁর কাছের বান্দা। শহীদের উপর সিদ্দিক ছাড়া কোন মর্যাদার স্তর নেই, আর তিনি তাঁর বান্দাদের শহীদ হিসেবে কবুল করতে ভালবাসেন, যারা তাঁর ভালবাসায় ও সন্তোষে তাদের রক্ত প্রবাহিত করে। শত্রুদের দমন করা ব্যতীত এই মাকাম লাভ করা সম্ভব নয়। [উদ্ধৃতির সমাপ্তি]

আল্লাহ বলেন, "তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে তা অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না।" [আল-বাকারাহ: ২১৬]

ইবনুল কাইয়্যিম আল-ফাওয়ায়েদে বলেন: এই আয়াতে বান্দার জন্য অনেক হিকমাহ, গূঢ় তাৎপর্য এবং মঙ্গল রয়েছে। সত্যিই বান্দা যখন জানে তার অপছন্দনীয় কিছু তার জন্য পছন্দের কিছু বয়ে আনতে পারে আর তার পছন্দনীয় কিছু তার জন্য অপছন্দের কিছু বয়ে আনতে পারে, তখন সে আনন্দদায়ক বিষয়ের ক্ষতি থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করবেনা আর ক্ষতিকর কিছু থেকে আনন্দের আশা সে ত্যাগ করবে না; কারণ সে ফলাফলের ব্যাপারে অবগত

নয়। আর এটা সুনিশ্চিত যে আল্লাহ যা জানেন বান্দা তা জানেনা। এটা বেশ কিছু বিষয় অপরিহার্য করে তোলে।

এর একটি হল যদিও প্রথমে কঠিন মনে হয়, আদেশ মেনে চলার চেয়ে উত্তম কিছু নেই। কারণ এটা কেবল ভাল ফলই বয়ে আনে আর এর সাথে আছে আনন্দ, সুখ আর তুষ্টি –যদিও নফস তা ঘৃণা করে। অন্যদিকে, হারাম কিছু করার চেয়ে ক্ষতিকর কিছুই নেই, যদিও নফস তা চায় আর তার দিকে প্রলুব্ধ হয়। কারণ এটা কেবল খারাপ ফলই বয়ে আনে, দুর্দশা, অশান্তি, বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। আর বুদ্ধিমত্তার বৈশিষ্ট্য হল বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্রতর কষ্ট সহ্য করা, একই ভাবে বৃহত্তর দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে ক্ষুদ্র ও স্বল্প সময়ের আনন্দ পরিত্যাগ করা।

এই আয়াতের গূঢ় তাৎপর্যের একটি হল, যিনি সব বিষয়ের ফলাফল সম্পর্কে অবগত বান্দা তাঁর উপর তাওয়াককুল করবে এবং তিনি তার জন্য যা পছন্দ করবে এবং যে সিদ্ধান্ত নিবেন তার উপর সন্তুষ্ট থাকবে আর এই কর্মের জন্য ভাল ফলাফলের আশা করবে।

আয়াতটির গূঢ় তাৎপর্যের আরেকটি হল, রব তার জন্য যা পছন্দ করেছেন তা ডিঙ্গিয়ে তার নিজস্ব কোন মতামত থাকবে না বা সে এমন কিছু চাইবে না যার ব্যাপারে তার কোন জ্ঞান নেই, কারণ এটা তার জন্য অজান্তেই অকল্যাণ ও ধ্বংস বয়ে আনতে পারে। বরং রবের সিদ্ধান্তের বদলে সে অন্য কিছু বেছে নেয় না, কেবল তাঁর কাছে দোয়া করে, তার জন্য যা সর্বোত্তম তাই যেন তিনি বেছে নেন আর সে যেন তার উপর সন্তুষ্ট থাকে, কারণ এর চেয়ে কল্যাণকর আর কিছুই হতে পারেনা।

আয়াতটির গূঢ় তাৎপর্যের আরেকটি হল, সে তার সব কিছুর জন্য আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে আর তিনি তার জন্য যা পছন্দ করেন তার উপর সন্তুষ্ট থাকে, তাঁর কাছে চায় যাতে তিনি তাকে শক্তি, দৃঢ়তা ও সবর দান করেন, আর বান্দা নিজে সিদ্ধান্ত নিলে যেসব

ক্ষতির সম্মুখীন হত তিনি যেন সেসব রোধ করেন, আর বান্দার স্বীয় সিদ্ধান্ত স্থলে তাঁর সিদ্ধান্তের সুফল বান্দার কাছে স্পষ্ট করেন।

আয়াতটির গূঢ় তাৎপর্যের আরেকটি হল, বিভিন্ন সম্ভাবনার ব্যাপারে সে কোন বেদনাদায়ক চিন্তাকে প্রশ্রয় দেবে না, তার অন্তর থেকে সব সিদ্ধান্ত ও বিষয়াদি ঝেড়ে ফেলবে যা তার উত্থান-পতনের কারণ হবে, এটা মাথায় রেখে যে, কদর থেকে কোন নিস্তার নেই। যদি সে আল্লাহর সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে তার কদর প্রশংসনীয়, কৃতজ্ঞ এবং মোকাবেলা করতে সক্ষম অবস্থায় তার কাছে পৌঁছাবে। অন্যথায় তা তার কাছে এমন অবস্থায় আসবে যখন সে বিহ্বল ও তা মোকাবেলা করতে অক্ষম। আর যখনই সর্ববিষয়ে তাওয়াক্কুল ও সন্তুষ্টি অটুট থাকে, তার জন্য নির্ধারিত কদর তাকে দরদ ও অনুগ্রহ সহকারে তাকে বেষ্টন করে। বিপদ থেকে এর সমবেদনা তাকে রক্ষা করে, এর অনুগ্রহ তার উপর আপতিত কদরকে মোকাবেলা করা সহজ করে। তাই কদরের কাছে মৃতের মত আত্মসমর্পণ করার চেয়ে তার জন্য মঙ্গলজনক কিছুই নেই। নিশ্চয়ই শিকারি পশু শব খেয়ে তৃপ্ত হতে পারেনা।

বসে থেকে সে আমাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল,
তাদের যাবতীয় দুর্দশার অশ্রু অনবরত গড়িয়ে পড়ছিল।
হে আমার ভাতিজি, আল্লাহর কদর আমাকে চালিত হতে বাধ্য করে।
আল্লাহ যা করেন, আমি কি তা প্রতিহত করতে পারি?
আর যদি আমি প্রত্যাবর্তন করি, তবে সকল সৃষ্টির রব আমাকে প্রত্যাবর্তন করেন,
আর যদি আমি রবের সাক্ষাতে চলে যাই, তবে আমার জায়গায় অন্য কাউকে তালাশ কর।
আমি খোঁড়া বা অন্ধ নই, যে আমি অব্যাহতি পাব,
তাদের মত শক্ত হৃদয়েরও নই, যারা পথ খুঁজে পায় না।

আত-তাবারী তার 'তারিখ' গ্রন্থে ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এক সাহাবী বলেন, "আমার ভাই ও আমি উহুদে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে ছিলাম, আহত অবস্থায় যখন তার ঘোষক শত্রুদের তাড়া করতে নির্দেশ দিল, আমি আমার ভাইকে বললাম বা সে আমাকে বলল, 'আমরা কি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে অভিযান থেকে বঞ্চিত হব?' আল্লাহর কসম আমাদের চড়ার মত কোন পশু ছিল না আর আমরা দুই জনেই ছিলাম ভীষণ আহত। কিন্তু আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ সাথে বেরিয়ে পড়লাম। আমি ছিলাম সবচেয়ে কম আহত, তাই তিনি যখন পারছিলেন না আমি তাকে কিছু রাস্তা বহন করে নিচ্ছিলাম আর কিছু রাস্তা তিনি হেঁটে পার হচ্ছিলেন, যতক্ষণ না মুসলিমদের কাছে পৌঁছাই"।

আবু দারদা বলেন, "ঈমানের চূড়া হল বিধির উপর সবর করা আর কদরের উপর সন্তুষ্টি।" আর এই ঔষধের সাহায্যেই আমরা এখানে-সেখানে জখমের চিকিৎসা করি।

উপরোল্লিখিত সত্যগুলো বোঝার পরে আমরা উপলব্ধি করতে পারব ফাল্লুজার যুদ্ধে সংগঠিত ঘটনা গুলো কিভাবে পুঞ্জিভূত হয়েছে, এর দৃঢ়তা ও সমস্ত শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

আজ এটাই ইসলামের মুখ্য ঘাঁটি। এখানকার দৃঢ়তা ও রিবাত মানে সেই মুখ্য ঘাঁটি রক্ষা করা, যাতে সেখান থেকে আমরা কুফর ও জুলুমের উপর হামলা চালাতে পারি।

এর মানে এই নয় যে শত্রুদের শহরের গভীরে প্রবেশ ও অবস্থান নেয়া বা শহরের আশে পাশে তাদের সুদৃঢ় অবস্থান নেয়া কে আমরা তাদের বিজয় বা লক্ষ্য পূরণ মনে করি। না, কারণ এই শত্রুর সাথে আমাদের যুদ্ধ রাস্তা আর শহর দখলের যুদ্ধ, বিভিন্ন ধরনের -আক্রমণাত্মক ও রক্ষণাত্মক- সামরিক কৌশল প্রয়োগের যুদ্ধ। আর তীব্র যুদ্ধগুলোর ভাগ্য কেবল কিছু দিন বা সপ্তাহের মধ্যেই নির্ধারিত

হয়ে যায় না; বরং যেকোনো পক্ষের সফলতার ঘোষণা আসতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়।

আমাদের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, ফাল্লুজার বরকতময় ভূমিতে ইসলামের সন্তানদের পর্বতসম দৃঢ়তা দেখে চূড়ান্ত ফলাফলের নির্ধারণের আগেই আমাদের চোখগুলো শীতল হয়ে গেছে, তাদের এই অবিচলতায় রয়েছে উম্মাহ'র জন্য অনমনীয়তা, ধৈর্য ও সংশয়হীনতার নতুন শিক্ষা। হয়তবা আমরা এই শিক্ষাগুলোর কিছুটা এই মহান লড়াইয়ের ফলাফলে আলোকপাত করবো।

প্রথমত, এই লড়াই শৌর্য, সম্মান ও প্রতিরোধের নতুন অর্থ এনে দিয়েছে, উম্মাহ নিশ্চিত হয়েছে যে তার একদল সন্তান আছে যারা ভয়াবহ বিপদ কে সাহস, অবিচলতা ও দৃঢ় সংকল্পের সাথে প্রতিরোধ করতে সক্ষম আর এই দল তাদের প্রকল্প ও পরিকল্পনায় উম্মাহর সাথে সত্যবাদী, এর মাধ্যমে উম্মাহর পুনর্জাগরণ ঘটেছে এবং একারণে এর সদস্য ও নেতাদের প্রায়ই রক্ত ঝরে।

দ্বিতীয়ত, উম্মাহ এই ভঙ্গুর ও অপমানিত অবস্থায় উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, তার অল্প কিছু সন্তান কেবল হালকা অস্ত্র দিয়েই দুনিয়ার প্রধান শক্তি ও জালিমদের সাথে লড়াই, প্রতিরোধ ও রিবাত করতে সক্ষম, শত্রুদের প্রভূত ক্ষতি করতে এবং তাদের পরাজয়ের তিক্ত সুধা পান করাতে বাধ্য করা সম্ভব।

তৃতীয়ত, ফাল্লুজা তার প্রতিযোগীদের জন্য যুদ্ধক্ষেত্র খুলে দিয়েছে, ইরাকের ভিতরে-বাইরে ইসলামের সন্তানদের উদ্যমের প্রজ্বলন ঘটেছে আর এর ভূমিতে জিহাদের মূল্য দিতে এবং বৈশ্বিক ক্রুসেডারদের সমরাভিযান প্রতিরোধ করতে এর সন্তানগণ খাঁটি রক্ত বিলিয়ে দিয়েছেন। ইরাকের বিভিন্ন এলাকায় যুদ্ধ ও ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ সংগঠিত হয়েছে। ব্যাটালিয়ন ও দল গঠিত হয়েছে এবং মুজাহিদরা প্রতিরোধে গর্জে উঠেছেন। শত্রুদের কাফেলা জব্দ করেছেন, তাদের নিরাপত্তা বহর পাকড়াও করেছেন এবং তাদের অবস্থানগুলোতে হামলা

চালিয়েছেন। আর আল্লাহর রহমতে আমরা সমগ্র ইরাক জুড়ে তাদের অনেক ক্ষয়-ক্ষতি প্রত্যক্ষ করেছি। জিহাদের সন্তানেরা দেখেছেন আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত বাহিনীর রূপকথা তাদের চোখের সামনে কিভাবে ভেঙ্গে পড়েছে, গর্বের এই বিজয় ধারার কারণগুলোর একটি হল, এই ঘটনা থেকে লাভ করা আত্মবিশ্বাস। কল্পিত অক্ষমতা ও ভয় থেকে তাদের দৃঢ়সঙ্কল্প মুক্তি পেয়েছে আর তারা স্থিরসংকল্প ও কর্মিষ্ঠতার ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করেছেন।

চতুর্থত, ফাল্লুজার যুদ্ধ এক গুরুত্বপূর্ণ ও কৌশলগত বিজয় অর্জন করেছে, সবার জানা আছে যে, আমেরিকান মিলিটারি মেশিনের উৎকর্ষতা, তাদের সেনাদের উন্নয়ন, তাদের যুদ্ধের শৃঙ্খলা; সরাসরি সংঘর্ষে না জড়িয়ে নিরাপদ দূরত্বে থেকে শত্রুদের আঘাত করাই তাদের কৌশল, যাতে জীবনের হুমকি আছে এমন লড়াই থেকে আমেরিকান সৈন্যরা নিরাপদ থাকতে পারে। কিন্তু ফাল্লুজা পরিকল্পিত ভাবে এই মহা শক্তিধর মেশিনকে প্রলুব্ধ করে নিয়ে আসে অগতানুগতিক, রূঢ়, সরু অলি-গলি ও রাস্তার যুদ্ধের দিকে, যেখানে তারা তাদের শক্তি, সামর্থ্য ও যন্ত্রপাতি খরচ করেছে। বাসা-বাড়িতে অভিযান চালানোর জন্য আমেরিকান সৈন্যরা সরু গলি ও রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছিল, সেখানে তারা অপ্রত্যাশিত মৃত্যু ও ধ্বংসের মুখোমুখি হয়। শত্রুরা মুজাহিদদের গুলি ও অ্যামবুশের মুখে পড়ত। গেরিলা কৌশলের মুখে তাদের সামর্থ্য হুমকির মুখে পড়েছিল। তারা স্বল্প দূরত্বের সংঘর্ষে জড়াতে বাধ্য হয়েছিল, যেজন্য তারা প্রস্তুত ছিল না, ফলে তাদের বিপুল পরিমাণ জীবন ও যান্ত্রিক লোকসান গুণতে হয়েছিল।

পঞ্চমত, আমেরিকান সামরিক প্রশাসন মহা পরাজয়ের স্বাদ গ্রহণ করেছিল, যুদ্ধের পৃষ্ঠপোষক ও পরিকল্পকদের কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, সম্পূর্ণ ধ্বংসের মুখোমুখি হলেও মুজাহিদগণ বিরত হবেন না। জিহাদি মানসিকতা আমেরিকান ও বৈশ্বিক যুদ্ধ পরিকল্পনা জন্য এক উভয় সংকট হয়ে উঠল। ফাল্লুজায় যে গর্বের কীর্তি আর অবিচলতার মহড়া সংগঠিত হয়েছিল, তাতে শত্রু-নেতাদের সংকল্প

দুর্বল হয়ে পড়ে, তাদেরকে বিষাদগ্রস্ত, উদ্বিগ্ন ও বিভ্রান্তি করে তোলে। তাদের জন্য ভবিষ্যতে যা অপেক্ষা করছে তা আরো তিক্ত, আরো ভয়ংকর, বি-ইযনিল্লাহ।

ষষ্ঠত, ফাল্লুজা রিদ্দা, নিফাক ও গাদ্দারের মুখোশ খুলে দেবার মাধ্যমে অবিচলতা ও দৃঢ়তা সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছে। সে আলাভী সরকারের প্রতারণার ছদ্মবেশ খুলে দিয়েছে, ইরাকীদের রক্তের প্রতিরক্ষা আর তাদের যুদ্ধ ও দুর্দশা থেকে হেফাজত এবং তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সংগ্রামের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি উন্মোচন করেছে। সবাই দেখেছে কিভাবে তারা ফাল্লুজায় যুদ্ধে যাবার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেছে, শহরটির সন্তানদের নিষ্পাপ রক্ত ঝরিয়েছে, হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে, হাজারো মানুষকে বাস্তুচ্যুত করেছে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষার আড়ালে তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ঘটেছে ধ্বংস, ভাংচুর, সম্মান চ্যুতি ও সম্পদ চুরি।

সপ্তমত, এই যুদ্ধ কুৎসিত রাফিদাদের মিথ্যা মুখোশ খুলে দিয়েছে। তারা এই যুদ্ধে বিদ্বেষের সাথে গভীর ভাবে প্রবেশ করেছিল। তারা কুফফারের ইমাম জিনদিক আস-সিস্তানির আশীর্বাদে ফাল্লুজার বিরুদ্ধে এই বীভৎস সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ করে। নিরস্ত্র নারী, শিশু ও বৃদ্ধজনের হত্যা, লুণ্ঠন ও ধ্বংসের অপারেশনে তারা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। তারা তাদের অশুভ আত্মা নিয়ে বড়ো ধরনের অপরাধে লিপ্ত হয়- নিরাপদ আল্লাহর ঘরে ঢুকে তা অপবিত্র করে তাদের শয়তান আস-সিস্তানির ছবি টাঙ্গায় আর বিপুল আক্রোশের সাথে লিখে, "আজ তোদের জমি, কাল তোদের সম্মান (নারী)"

এটা জানা দরকার যে, ন্যাশনাল গার্ডের ৯০% সদস্যই বিদ্বেষী রাফিদা আর বাকী ১০% পেশমারগা থেকে আসা। আর উলামারা সত্যি বলেছেন তাদের প্রসঙ্গে, যখন এই উক্তি করেন, "তারা আসলে মাজুসের দেশে ইহুদীদের দ্বারা রোপিত নাসারা বীজ।"

অষ্টমত, এই যুদ্ধে আগে শত্রুভাবাপন্ন ছিল এমন কিছু দলের মাঝে সামরিক সহযোগিতা দেখা গেছে, এতে জিহাদের শত্রুদের লুকানো সারি প্রকাশিত হয়ে গেছে। ১৮ রাবাই সহ ৮০০ ইসরায়েলি সেনা এ যুদ্ধে অংশ নিয়েছে বলে জানা গেছে, যাদের অনেকে প্রাণ হারিয়েছে, এটা তাদেরই সাংবাদিক ও মিডিয়া প্রচার করেছে। একইভাবে জর্ডান মিলিটারি তাদের অফিসারদের মাধ্যমে এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছে, তারা শহরটিতে আক্রমণ ও তার পরিকল্পনায় সাহায্য করেছে। আর ফাল্লুজা যে জিহাদের এমন ভিত্তি ছিল যা আল্লাহর শত্রু কুফফার ও মুরতাদদের অস্থির ও নির্ঘুম করেছে, এ বিষয়টার বাস্তবতা সবার কাছে তুলে ধরেছে।

নবমত, এই যুদ্ধের বিশেষ ফলাফলের মধ্যে রয়েছে জিহাদের সন্তানদের শিরাতে নতুন রক্ত প্রবাহ, তাদের জিহাদের লক্ষ্যে পৌছাতে ঝাঁপিয়ে পড়া। এই যুদ্ধ নেতৃত্বের এক প্রজন্ম তৈরি করেছে, তৈরি করেছে কর্মশক্তি ও অভিজ্ঞতা যা এসেছে বাস্তব পরিস্থিতি আর প্রায়োগিক ও নির্দিষ্ট পথে সংগঠিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে, যা যুদ্ধের কাঠিন্যে পরিমার্জিত এবং এক কঠিন ও শক্তিশালী ছাঁচে প্রস্তুত।

আয-যিলালের লেখক বলেন, “আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ফলে দুঃখ-কষ্টে ও মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ায় নফস ঝুঁকি-আশঙ্কায় অভ্যস্ত হয়ে যায়, এটা এতই ভয়ানক যে, বহুলোক তা এড়াতে তাদের নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিসর্জন দেয়। যদিও যারা এতে অভ্যস্ত, তারা তা থেকে নিরাপদ হোক বা না হোক, তাদের জন্য এটা সহজ একটা ব্যাপার। বিপদ-আপদ আসলে আল্লাহর দিকে ছুটে যাবার মাঝে ইলেকট্রিক শকের মত একটা আবহ তৈরি হয়, যা আত্মা ও হৃদয়কে বিশুদ্ধতা, পরিচ্ছন্নতা ও ন্যায়নিষ্ঠার সাথে নতুন ভাবে গড়ে তোলে। মানব সমাজের সার্বিক সামঞ্জস্য সাধনের জন্য মুজাহিদদের হাতে নেতৃত্ব অর্পণ করা হয়, যাদের আত্মা দুনিয়ার বিলাস-ব্যসন পরোয়া করে না আর পুরো জীবনটাই তাদের জন্য গুরুত্বহীন, যখন তারা

আল্লাহ রাহে মৃত্যুর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর তাদের অন্তরে কিছুই আসে না, যা তাদের আল্লাহ ও তাঁর সন্তুষ্টি অন্বেষণে মনোযোগে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।”

যখন নেতৃত্বের ভার এমন কারো হাতে অর্পিত হয় তখন দুনিয়া ও তার অধিবাসীদের সবকিছু ঠিক ভাবে পরিচালিত হয়। আর নেতৃত্বের ব্যানার তাদের রক্ত, জীবন আর তাদের কাছে প্রিয় ও দামী যা কিছু আছে তা অকাতরে বিলিয়ে দিয়ে ব্যানার কেনার পর- যা তাঁরা আল্লাহর জন্য খরিদ করে, নিজের জন্য নয়- কুফর, গোমরাহ এবং দুর্নীতির কাছে তা সমর্পণ করা অসম্ভব হয়ে যায়।”

তারপর, আল্লাহ যাদের ভাল চান তাদের জন্য তাঁর সন্তুষ্টি ও সীমাহীন পুরষ্কার অর্জন করা সহজ হয়ে যায়, আর যদি তিনি তাদের মন্দ চান তবে আল্লাহর গায়েবের ইলমের ভিত্তিতে তারা আল্লাহর ক্রোধ ও গযব অর্জন করে।”

দশমত, সেখানে রয়েছে সবচেয়ে সেরা বাছাই প্রক্রিয়া, আর তা হলো শাহাদাহ, মুমিনদের এই দলটি শাহাদাহ’র মাধ্যমে তাদের সন্তানদের রক্ত দিয়ে এই পথের মানচিত্র অঙ্কনের সম্মানে সম্মানিত হয়েছে। আর তাদের বড় নেতা ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা যুদ্ধে সম্মুখসারিতে ছিল, এটা যদি কোন ইংগিত করে থাকে তা হল, জিহাদের সন্তানদের সিদক (সত্যনিষ্ঠা) ও পুরো ইখলাসের সাথে তাওহীদ ও আকিদার দাবি পূরণে তাদের নির্ভেজাল দৃঢ়সংকল্পতা। তাদের জন্য সুসংবাদ যে, আল্লাহ তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য তাদের মধ্য থেকে চমৎকার ও সেরাদের বেছে নিয়েছেন, সেভাবে তিনি তাদের জন্য শাহাদাহ ও বিজয়ের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, যার আশা তারা করেছে আর যার আবেদন তারা করেছে। তাই তিনি তাঁর ওয়াদা পূরণ করেছেন আর তারা যা চেয়েছে তা তিনি তাদের দিয়েছেন।

এমনই সালাফ সালেহীনদের অবস্থা, যারা মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা

করেছেন আর তাদের উত্তরসূরিরা করেছে জীবনের। শাহাদাহ ছিল তাদের সবচেয়ে প্রিয় অভিলাষ, আর তারা যুদ্ধের ময়দানে ছুটে যেতেন, আল্লাহর জন্য কতল করতে ও কতল হতে ভালবাসতেন। আর সাহাবাদের মধ্যে যুদ্ধে শাহাদাত পাবার হার ছিল ৮০%।

ইয়ামামাহ'র যুদ্ধে শাহাদাত প্রাপ্তদের অর্ধেকের বেশিই ছিল মুহাজির ও আনসার আর ক্বারী, যারা ছিলেন কুরআনে হাফিয ও তৎকালীন সময়ের মুসলিমদের মাঝে উলামা। আমাদের জন্য তাদের শহীদদের সংখ্যা উল্লেখ করাই যথেষ্ট – তাদের ৩০০ জন ইয়ামামাহ'র যুদ্ধে শহীদ হন, আর আরেক রেওয়ায়েতে এই ৫০০ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তার মানে হল, এই এক যুদ্ধেই ক্বারী শহীদদের সংখ্যা ছিল মোট শুহাদার ২৫-৪৫%, আর এটা অবশ্যই অনেক বড় সংখ্যা।

যারা সাহাবাদের জীবন নিয়ে গবেষণা করেন তারা দেখবেন, তাদের প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে কেবল এক জন বিছানায় মৃত্যুবরণ করেন, বাকী চার জন জিহাদের ময়দানে শহীদ হিসেবে মারা যান। তাই হিজরার প্রথম শতকে অর্জিত দ্রুত ও বর্ণাঢ্য বিজয় ধারা দেখে আশ্চর্য হবেন না।

এখানে আমেরিকান ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে ফাল্লুজার যুদ্ধে আমাদের বীর মুজাহিদদের অবিচলতার প্রশংসা আর তাদের উপর আল্লাহর রহমতের, কেরামতের ও কষ্ট লাঘবের এক ক্ষুদ্র অংশের উল্লেখ করা দরকার। তাদেরকে দৃঢ়তা দেয়া হয়েছে আর তাদের অবস্থা সুস্থির ছিল।

যুদ্ধের তৃতীয় দিনে ফাল্লুজার বিভিন্ন এলাকায় কঠোর ও ভারী বোমা বর্ষণের পর মুজাহিদিন জেগে উঠে দেখলেন, আমেরিকান যান ও ট্যাঙ্ক তাদের রাস্তায়, সড়কে, অলি-গলিতে। আবু আযযাম, উমার হাদিদ, আবু নাসির আল-লিবি, আবুল হারিস মুহাম্মাদ জাসিম আল-ইসায়ী ও অন্য বীরদের নেতৃত্বে আহলুল ইসলামের নেতৃস্থানীয়রা

বিভ্রান্তিকর অবস্থার মাঝেই তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং হানাদার বাহিনীকে ফাল্লুজার প্রান্তদেশে পিছু হটতে বাধ্য করলেন। এই যুদ্ধে তাদের অস্ত্র ছিল স্রেফ পিকা মেশিনগান আর কালাশনিকভ রাইফেল।

আমেরিকানরা নির্বিচার হত্যার মুখোমুখি হয়েছিল, এর ব্যাপ্তি এতই তীব্র ছিল যে তারা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে মুসলিমদের বাস-ভবনে লুকানো শুরু করল। শুরুতে মুজাহিদিন মুসলিমদের ক্ষতির ভয়ে তাদের বাসায় ঢুকলেন না, কিন্তু যখন তারা আমেরিকান সেনাদের সেখানে অবস্থানের ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন (তারা সেখানে তাদের তাড়া করা শুরু করলেন), তারা দেখলেন আমেরিকান সেনারা কাপুরুষের মত পালিয়ে আছে, তারা তাদের গুবরেপোকা আর মাছির মত মারা শুরু করলেন, সকল শ্রেষ্ঠতা ও বরকত কেবল আল্লাহর তায়ালার।

যুদ্ধের কিছু দিন পরে এক আমির উমার হাদিদ ও আবদুল-হারিস জাসিম আল-ইসায়ীকে প্রস্তাব করলেন যে, ফাল্লুজা থেকে বের হবার নিরাপদ পথ প্রস্তুত হলে তারা যেন তাদের দাঁড়ি শেভ করে (কুফফারদের ধোঁকা দেবার জন্য) শহরের বাইরে যান এবং বাইরে থেকে কাজ করেন। কিন্তু এই দুই বীর এই প্রস্তাবের সায় দিলেন না, বললেন, "আল্লাহর কসম, দৃঢ়পদ শেষ মুহাজির শহরে থাকা পর্যন্ত আমরা বের হব না।" আর তারা মৃত্যু আলিঙ্গন করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে গেলেন, আল্লাহ তাদের উপর রহম করুন এবং তারা শহীদ বান্দাদের মাঝে তাদেরকে কবুল করুন।

কিছু ভাই বেশ কয়েক দেন ধরে প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত ছিলেন, কেবল আল্লাহর উপর তাওয়াককুল ও ভরসা করলেন, পেয়ে গেলেন বিশাল এক তরমুজ, কাটার পর দেখা গেল অসম্ভব লাল তার রং, বেশ কিছু দিন ধরে তারা তা খেলেন, তাদের ক্ষুধা মিটল, আল্লাহর কাছে তারা শোকর আদায় করলেন আর উপলব্ধি করলেন, সেই তরমুজের মত

মনোরম খাবার দুনিয়াতে আর নেই, মজার ব্যাপার হল সে সময়টা তরমুজের মৌসুম ছিল না আর সেই এলাকা তরমুজ উৎপাদনের জন্য পরিচিত ছিল না।

আরো কিছু ভাই খাবার ও পানির ব্যাপক সঙ্কটে ছিলেন, তাদের কাছে পানি এতই কম ছিল যে তাদের মুখ-ঠোঁট ফাটা শুরু করেছিল। প্রচণ্ড তৃষ্ণা মেটাতে একটু পানির খোঁজে বের হলেন, হঠাৎ এক বাসায় ঢুকে দেখলেন তিন কন্টেইনার পানি, অদ্ভুত ভাবে সারিবদ্ধ। তারা খুবই অবাক হলেন, কারণ ফাল্লুজা বা ইরাকের অন্যান্য এলাকায় এরকম অদ্ভুত সুন্দর পানির কন্টেইনার দেখা যায় না। তারপর তারা যখন সেই পানির স্বাদ নিলেন, তারা বুঝতে পারলেন এটা দুনিয়ার সাধারণ পানি নয়, তারা তাদের তৃষ্ণা মেটা পর্যন্ত পান করলেন। তারা কসম করে বললেন যে, সারা জীবনে এরকম কিছু তারা পান করেন নি।

জাযিরার এক ভাইয়ের মাথায় স্নাইপারের বুলেট আঘাত হানল, বুলেটটি তারা কপাল দিয়ে ঢুকে ঘাড় দিয়ে বের হয়ে গেল, তার মস্তিষ্কের কিছু অংশ ডান কাঁধের কাছে ঝুলে রইল। তার সাথের ভাইয়েরা তার সেবায় ছুটে এলেন, মস্তিষ্কের সেই অংশ তারা জায়গামত ঢুকিয়ে দিলেন এবং জখমের স্থানে ব্যান্ডেজ করে দিলেন। তিনি কিছু দিন পরে ভাল হয়ে উঠলেন, তিনি এখনো জীবিত এবং ভাল আছেন, কেবল তার কথা একটু ধীর হয়ে গেছে। দোয়া করি আল্লাহ যেন তাঁকে ও ভাইদেরকে কবুল করুন।

মিশক এর গন্ধের ব্যাপারে আর কি বলব... বিপুল সংখ্যক মুজাহিদিন এ ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করেছেন, আমাদের বহু ভাই বলেছেন শুহাদাহ ও আহতদের শরীর থেকে মিশকের গন্ধ আসার কথা, আল্লাহ তাদের সবাইকে কবুল করুন।

আবু তালহা আল-বায়হানি আহত হলেন, তার অবস্থা ছিল

সংকটময়, কিন্তু চমৎকার সুগন্ধ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল, এমনকি আশে পাশের রাস্তা থেকেও কিছু ভাই তার গন্ধ পেলেন। তিনি শহীদ হিসেবে মৃত্যু বরণ করলেন, আমারা তাকে সেভাবেই বিবেচনা করি, আল্লাহই তার বিচারক আর আমরা তার ব্যাপারে আল্লাহ ফায়সালা অনুমানের ধৃষ্টতা দেখাই না।

এই যুদ্ধে উপস্থিত অনেকেই অবিচলতা ও নিশ্চয়তা সম্পর্কে বলেছেন, তারা যুদ্ধের সবচেয়ে কঠিন কিছু সময়ে ঘোড়ার হ্রেষা ধ্বনি ও তরবারির ঝংকার শুনার কথা উল্লেখ করেন। ভাইরা খুব বিস্ময়াভিভূত হলেন এসব শুনে, তারা আনসারী ভাইদের ফাল্লুজার আশে পাশে ঘোড়া থাকার কথা জিজ্ঞেস করলেন, আনসারীরা না বোধক উত্তর দিলেন, তারা নিশ্চিত হলেন সেই এলাকায় কোন ঘোড়া কোন অস্তিত্ব ছিল না, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর।

আহমাদ তার মুসনাদে ও আল-হাকিম আল-মুসতাদরাকে আবু মুসার ভাই আবু বুরধা ইবন কাইস থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “হে আল্লাহ, আমার উম্মতের শেষ যেন আপনার রাহে মৃত্যুর মাধ্যমে হয়, বিদ্ধ হয়ে ও মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে।”

আল্লাহ বলেন, “আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকা-প্রাপ্ত। আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদযাপন করছে। আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌঁছে নি, তাদের পেছনে তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ, তাদের কোন ভয় ভীতি নেই এবং কোন চিন্তা ভাবনাও নেই।” [আল-ইমরান: ১৬৯-১৭০]

রাজার মত বাঁচ বা সম্মান নিয়ে মর, কারণ যদি তুমি মর,

তোমার তলোয়ার খাপ মুক্ত হয়েছে, আর তোমার মাগফিরাহ তরবারীতেই।

এটা ফাল্লুজার বরকতময় ভূমিতে সংগঠিত অবিচলতা ও সহিষ্ণুতার ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এই অর্জনের অনেক সুফল ও এর বিশাল প্রভাব রয়েছে। যেকেউ নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে তা বুঝতে পারবে।

হে ইসলামের উম্মাহ! আপনারা আহত হয়েছেন, প্রচণ্ড ভাবে বেইজ্জত হয়েছেন, আপনার রোগের উপশম আছে একমাত্র জিহাদের ব্যানারে বাঁধা তৌহিদে। কবে আপনারা (জিহাদে) এগিয়ে যাবার সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে আপনাদের জল্লাদের হাত থেকে মুক্তি নিবেন? আজকের যুদ্ধ থামবে না আর আমাদের নবী ﷺ আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে বের হওয়া সেনা দল থেকে দূরে বসে থাকতে ভালবাসতেন না। বরং তিনি সব সময় জিহাদি আক্রমণ চালিয়ে গেছেন।

আহযাবের যুদ্ধের পরে জিবরীল عليه السلام ও রাসূলুল্লাহ ﷺ মধ্যে সংগঠিত আলোচনার কথা মনে করিয়ে দিতে চাই, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনার দিকে গেলেন, তিনি তার অস্ত্র নামিয়ে রাখলেন আর সাথে সাথে জিবরীল عليه السلام এসে বললেন, "আপনি আপনার অস্ত্র নামিয়ে রাখলেন? আল্লাহর কসম, ফেরেশতারা এখোন তাদের অস্ত্র নামিয়ে রাখেন নি! আপনি ও আপনার সাথে যারা আছেন সবাই বনু কুরাইজার দিকে যান, আমি আপনার আগে আগে তাদের দিকে যাচ্ছি, তাদের দুর্গে তাদেরকে কাঁপিয়ে দিতে এবং তাদের অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত করতে।" তারপর জিবরীল عليه السلام ফেরেশতাদের নিয়ে আর রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাজিরিন ও আনসারদের নিয়ে এগিয়ে গেলেন।

আপনার ভাইদের - দ্বীনের সন্তানদের বিরুদ্ধে - সব ধরনের অত্যাচার, খুন ও ক্ষয়-ক্ষতি করা হয়েছে, আপনার কাছে কি এটা ছোট-খাট ব্যাপার? আপনি নিরাপদে আপনার পরিবার আর ধন

সম্পদের মাঝে ঘরে বসে আছেন! এটা কি করে সম্ভব হল?!

আল্লাহ বলেন, “আল্লাহ তার বিষয়ের উপরে ক্ষমতাবান কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না।” [ইউসুফ: ২১]

আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন।